MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
www.vanguardonline.info | www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র।
ফেব্রুয়ারি ২০২১
দাম : দশ টাকা

# মার্কসবাদের অনুশীলনের মাধ্যমে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লেনিন আজও আমাদের শিক্ষক-পথপ্রদর্শক

[গত ২১ জানুয়ারি '২১ ছিল সর্বহারার মহান নেতা মহামতি লেনিনের ৯৭তম মৃত্যুবার্ষিকী। লেনিনের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গত '২০ সালের মে মাসে ভ্যানগার্ড অনলাইন বুলেটিন-২ এ প্রকাশিত নিবন্ধটি প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় বর্তমান সংখ্যায় সামান্য সংযোজন-সংশোধন করে পুনঃমুদ্রণ করা হলো-সম্পাদক]

২০২০ সালের ২২ এপ্রিল ছিল বিশ্বের প্রথম শ্রমিকশ্রেণির রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য নভেম্বর বিপ্লবের বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সফল রূপকার লেনিনের একশ পঞ্চাশতম জন্মবার্ষিকী। বিশ্বের কোটি কোটি শোষিত মানুষের প্রাণে আশার আলো জ্বালিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মহামতি লেনিনের শ্রমিকশ্রেণির প্রতি ভালোবাসা আর মার্কসবাদের প্রয়োগে মেধা ও প্রজ্ঞার সংমিশ্রণে গড়ে তোলা বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সফলতায়। যদিও অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলেও এই কথা সত্য যে, সেই সোভিয়েত ইউনিয়ন আজ আর নেই। তবু, লেনিন মানেই বুকের মাঝে বিপ্লবের স্পন্দন, লেনিন মানেই বিদ্রোহ, লেনিন মানেই অন্যায়ের প্রতিরোধে সংকল্পবদ্ধ যুদ্ধ, লেনিন মানেই মানুষের প্রতি অফুরন্ত ভালোবাসা, লেনিন মানেই এগিয়ে চলার আহ্বান, লেনিন মানেই বিপ্লবের হাতছানি।

বিশ্ব আজ নভেম্বর বিপ্লবের দিন থেকে অতিক্রম করেছে একশত বছরেরও বেশি সময়কাল। বিশ্ব আজ বদলে গেছে অনেকটাই। শুধু গত শতাব্দীতেই ঘটে গেছে দুই দুটো মহাযুদ্ধের বীভৎসতা। ইতিহাস প্রত্যক্ষ করেছে ফ্যাসিবাদের মনুষ্যত্ব ধ্বংসকারী মানবতাবিরোধী হিংস্রতা আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে লগ্নীপুঁজির আগ্রাসনের রূপ। এরই মাঝে মনুষ্যত্ব, বিবেক, সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার আশা জ্বালিয়ে মরুদ্যানের মতো যে সোভিয়েত সমাজ গড়ে উঠেছিল তারও পতন ঘটেছে গত শতাব্দীতেই। আজ বিশ্বের দেশে দেশে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে স্বৈরতন্ত্র। পুঁজির শোষণ আর লুণ্ঠনের বেড়াজালে মানুষের জীবন হয়ে উঠেছে দুর্বিষহ। আর ঠিক সেই কারণেই লেনিন প্রাসঙ্গিতা নিয়ে ফিরে আসছেন, ফিরে আসছেন বলতে কি করিতে হইবে (What is to be done)। ঘোর তমসাচ্ছন্ন দিনে তিনিই আমাদের আলোর দিশারী যিনি হাঁক দিচ্ছেন–কমরেড! দুই পা পিছালে এখন সামনে এক পা বাড়ানোর সময়। কিন্তু যে প্রশ্নের উত্তর মানুষ খুঁজে ফেরে তা হলো কীভাবে এগোন যাবে সেই পথে? হ্যাঁ, আজও মার্কসবাদের অনুশীলনের পথে এক পা এগোতে হলে লেনিনই আমাদের চিন্তানায়ক, শিক্ষক, পথ প্রদর্শক। এখন অনেকে বলছেন লেনিন দিয়ে চলবে না অন্যকিছু লাগবে। যাঁরা বলছেন, লেনিন দিয়ে চলবে না তাদের বক্তব্য নিশ্চিতভাবে নিক্ষিপ্ত হবে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে।

মার্কস বলেছিলেন, যে দর্শনের কাজ শুধু দুনিয়াকে ব্যাখ্যা করা নয়, আসল কাজ হলো সমাজের পরিবর্তন। সেজন্যই মার্কসবাদ শুধুই নিছক তত্ত্ব না, এ দর্শন সমাজ বদলের হাতিয়ার। মার্কসীয় সমাজবিপ্লবে তাই বিপ্লবী তত্ত্বের প্রায়োগিক দিক অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ। লেনিন কমিউনিস্ট আন্দোলনের পূর্বসূরীদের থেকে পাওয়া অনুশীলনের অভিজ্ঞতার সামান্য পুঁজিকে হাতিয়ার করেই সেই তত্ত্বের প্রায়োগিক দিককে পূর্ণতা দিয়েছিলেন। এই কারণেই লেনিনবাদের চর্চা ছাড়া মার্কসবাদের পাঠ হৃদয়ঙ্গম করা পূর্ণতা পায় না। তত্ত্বের সাধারণ সুত্রগুলো অনুশীলন করার মাধ্যমেই যে তাকে বিশেষীকৃত করে তুলতে হয় কারণ মার্কসবাদের প্রাণসত্তা হলো বাস্তব অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণ (the living soul, of Marxism—a concrete analysis of a concrete situation') (ভল্যুম-৩১, পৃ-১৬৬), সেই কথা অনুভব করেই লেনিন সেই তত্ত্বকে বিশেষীকৃত করার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি যে শিক্ষা আমাদের কাছে রেখে গিয়েছেন তা হলো যে মার্কসবাদ সম্পূর্ণও নয়, অলঙ্ঘনীয়ও নয়। বরং এটা একটা বিজ্ঞানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছে মাত্র, যাকে সমস্ত দিক থেকে বিকশিত করা সমাজতন্ত্রীদের অন্যতম কাজ। রাশিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বিপ্লবী তত্ত্বকে লেনিনকে স্বাধীনভাবে গড়ে তুলতে হয়েছিল। কারণ, তিনি বুঝেছিলেন যে, এই তত্ত্ব শুধুমাত্র বিপ্লবের সাধারণ দিকনির্দেশনা দেয়। যখন তাকে প্রয়োগ করতে যাওয়া হবে তখন ইংল্যান্ডে যেমনভাবে হবে ফ্রান্সে সেইভাবে হবে না, ফ্রান্সে যেমন হবে জার্মানিতে তেমন হবে না, আবার জার্মানিতে যেমন হবে রাশিয়াতে তেমন হবে না। (ভল্যুম-৪, পৃ-২১২)

অবশ্য তার আগেই, বস্তুত বিপ্লবী জীবনের শুরুতেই, সামারার মার্কসিস্ট সার্কেলে লেনিন উদারনৈতিকদের সমালোচনা করে কয়েকটি বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতাগুলি ছিল প্রায় দুই বছরের অধ্যয়ন ও ভাবনা চিন্তার ফসল। এর ভিত্তিতে তিনি যে বৃহদাকার প্রচার পুস্তিকাটি তৈরি করেন 'জনগণের বন্ধু কারা এবং তারা কীভাবে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের মোকাবেলা করবে' ('What the "Friends of the People" Are and How They Fight the Social-Democrats'1894)। তাই ছিল রাশিয়ান বিপ্লবের তাত্ত্বিক কাঠামো তৈরির প্রাথমিক প্রস্তুতি।

এই বইয়ের হাতে লেখা কপি গোপনে মার্কসিস্ট সার্কেলগুলোতে পাঠ করা হয়েছিল এবং নতুন পথের দিশা দেখিয়ে সবাইকে উদ্দীপ্ত করেছিল। ক্রুপস্কায়া তাঁর স্মৃতিচারণায় এই বইয়ের বিশেষ আবেদন উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন–'আমার মনে আছে এটি কীভাবে আমাদের সকলকে শিহরিত করেছিল। সংগ্রামের লক্ষ্যগুলি প্রশংসনীয় স্পষ্টতার সাথে বইয়ে প্রকাশ করা হয়েছিল। এর Hectogrhaped অনুলিপিগুলি পরে 'ইয়েলো কপি-বুকস' নামে এক হাত থেকে অন্য হাতে বিভিন্ন মার্কসিস্ট সার্কেলে প্রচারিত হয়েছিল।'

সেন্ট পিটার্সবুর্গে সেই সময় অনেকগুলো মার্কসবাদী শ্রমিকচক্র সক্রিয় ছিল। লেনিন প্রায় ২০টির মতো গ্রুপকে একত্রিত করে 'শ্রমিকশ্রেণির মুক্তি সংগ্রাম সংঘ' (League of Struggle for the Emancipation of the Working Class) গঠন করেন। লেনিনের যুক্তি মেনে এই সংগঠনে নীতিগতভাবে শ্রমিকশ্রেণির রাজনৈতিক নেতৃত্বদানের মার্কসীয় ব্যাখ্যা এবং শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করার উদ্দেশ্য গৃহীত হয়। লেনিন প্রস্তাব করেছিলেন যে শুধুমাত্র যে কয়জন অগ্রসর শ্রমিক পাঠচক্রে নিয়মিত আসেন তাদের মধ্যেই মার্কসবাদী মতবাদ প্রচার করার কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে জনগণের দৈনন্দিন সমস্যাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলা ও মার্কসবাদের গণপ্রচারের গুরুত্ব দেওয়া একান্তই আবশ্যক। রাশিয়ার শ্রমিক আন্দোলনে লীগের এই ভূমিকা গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ওই শতাব্দীর নয়ের দশকে শিল্প কলকারখানার প্রসার ঘটছিল এবং তারই সাথে শ্রমিকের সংখ্যাও বেড়ে চলছিল। শ্রমিকদের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে নানা জায়গায় ধর্মঘটের সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এই সব ধর্মঘটে শ্রমিকদের অংশগ্রহণও ছিল উল্লেখযোগ্য পরিমাণে। বলশেভিক পার্টির ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৮৯৫ সাল থেকে ১৮৯৯ সালের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মঘটে প্রায় দুই লক্ষ একুশ হাজার শ্রমিক অংশ নিয়েছিল। এই ঘটনা অর্থাৎ রাশিয়ার রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণির বিশিষ্ট শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ, নারদনিকদের ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে মার্কসবাদীদের যৌক্তিক অবস্থানকে সঠিক প্রমাণ করেছিল।

লেনিনের নেতৃত্বে ও নির্দেশনায় লীগ এই সময় প্রতিটি কলে-কারখানায় শ্রমিক বিক্ষোভের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলে। কলে কারখানায় শ্রমিকদের শোষণ, অত্যাচার ও দুরবস্থাকে কেন্দ্র করে তাদের সংগঠিত করে অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তোলার পাশাপাশি, তাদের মুক্তির পথ হিসাবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের রাজনৈতিক দর্শন প্রচারের কাজও এই সময় শুরু হয়। লেনিন বিভিন কারখানার শ্রমিকদের কাছ থেকে বিশেষ পরিস্থিতির বর্ণনা, বাস্তব তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করতেন এবং তার ভিত্তিতে ইশতেহার তৈরি করতেন। কলে-কারখানায় জারের পুলিশের চোখ এড়িয়ে সেই ইশতেহার প্রচার করা ছিল অন্যতম কাজ। সেন্ট পিটার্সবুর্গের সেমিয়ানিকভ কারখানার শ্রমিক ধর্মঘটের জন্য, থর্ন-টন মিলের শ্রমিকদের জন্য লেনিনের প্রচার পুস্তিকাগুলো এই সময়ে লেখা। এই ইশতেহারগুলো কারখানার আন্দোলনের দাবি তৈরি করতে বা আন্দোলনের পদ্ধতি ঠিক করতে শ্রমিকদের সাহায্য করত, তেমনি তাদের মনোবল বৃদ্ধি করতেও সাহায্য করত। শ্রমিকরা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে থাকে যে এই সমাজতন্ত্রীরাই আসলে তাদের প্রকৃত বন্ধু হিসাবে তাদের সাহায্য ও স্বার্থরক্ষা করছে। ১৮৯৬ সালে এইভাবেই লিগ সেন্ট পিটার্সবুর্গের সুতাকলে দৈনিক কাজের ঘন্টা কমানোর দাবিতে সফল ও দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট সংগঠিত করে। এই আন্দোলনের ফলে জার-সম্রাট দৈনিক শ্রম-ঘণ্টা সাড়ে এগারো ঘন্টার আইন চালু করে, এর আগে দৈনিক কাজের সময়ের কোন নির্দিষ্ট সীমা ছিল না। লিগের কর্ম তৎপরতা এবং বিভিন্ন কারখানায় তাদের নেতৃত্বে ধর্মঘট সংগঠিত হতে থাকায় আতঙ্কিত জার-সম্রাট ১৮৯৫ সালের ডিসেম্বর মাসে লেনিনকে গ্রেপ্তার করে। প্রথমে কিছুদিন সেন্ট পিটার্সবুর্গ শহরের জেলখানায় থাকার পর তাকে সাইবেরিয়াতে নির্বাসনে পাঠায়। লেনিনের দুটি বিখ্যাত পুস্তিকা–'ধর্মঘট' এবং জার সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লেখা 'জার-সরকারের প্রতি'–জেলে বসেই লেখা হয় এবং গোপনে বিপ্লবী ও ধর্মঘটী শ্রমিকদের মধ্যে প্রচারিত হয়।

সেন্ট পিটার্সবুর্গের লিগের নেতৃত্বে শ্রমিক আন্দোলন, উপুর্যপরি ধর্মঘট এবং তার সফলতা জার-শাসিত রাশিয়ার অন্যান্য প্রান্তে শ্রমিকদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ সৃষ্টি করে এবং শ্রমিক সংঘ গড়ে উঠতে থাকে। শ্রমিকশ্রেণি ও বিপ্লবীদের মধ্যে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল তাতে সুদূর ট্রান্সককেশিয়া, সাইবেরিয়া থেকে শুরু করে সামারা, কাজান, মস্কো সর্বত্র শ্রমিক সংঘের অনুরূপ সংগঠন গড়ে ওঠে। শুধু রাশিয়ার ভেতরেই নয়, এমনকি রাশিয়ার পশ্চিম সীমান্তের দেশগুলোতেও : যেমন পোল্যান্ড, লাটভিয়া, লিথুনিয়া ইত্যাদি, এই সময় সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। ১৮৯৭ সালের অক্টোবরে এই পশ্চিমের দেশগুলোর 'বুন্দ' নামে পরিচিত ইহুদিরা সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক ইউনিয়ন গড়ে তোলে। সেন্ট পিটার্সবুর্গের 'শ্রমিকশ্রেণির মুক্তি সংগ্রাম সংঘ'-এর বিপ্লবী অভিজ্ঞতা লেনিন পরবর্তী সময়ে মার্কসবাদী সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (বা বলশেভিক পার্টি) গড়ে তোলার কাজে প্রয়োগ করেছিলেন।

১৮৯৮ সালে সেন্ট পিটার্সবুর্গ, মস্কো, কিয়েভ এবং বুন্দের শ্রমিক সংঘগুলোকে একত্রিত করে একটি সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই উদ্দেশ্যে ১৮৯৮ সালের মার্চ মাসে মিনস্ক শহরে পার্টি গঠনের জন্য কংগ্রেস আহ্বান করা হয়। লেনিন সেই সময়ে জেলে ছিলেন এবং সেই কারণে উপস্থিত থাকতে পারেননি। নয় জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে এই কংগ্রেস থেকে 'রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টি' (আর.এস.ডি.এল.পি) প্রতিষ্ঠা করা হয়। লেনিন জেলে বসেই এই পার্টির একটি কর্মসূচির খসড়া রচনা করেছিলেন। যদিও কংগ্রেসে গৃহীত কর্মসূচি লেনিনের খসড়া অনুযায়ী হয়নি। সর্বহারাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকার, সর্বহারা একনায়কতন্ত্র (dictatorship of the proletariate) এবং বিপ্লবে সর্বহারাশ্রেণির মিত্রদের কোন কথা কর্মসূচিতে ছিল না। ফলে, কংগ্রেসের মাধ্যমে গঠিত হওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন ধরণের মতাবাদিক পার্থক্য দেখা দেয়। প্রতিটি বিতর্কে লেনিনকে মার্কসবাদী চিন্তার রূপরেখা দাঁড় করাতে হয়। কারণ, তিনি বলেছিলেন যে বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া কোন বিপ্লবী আন্দোলন হতে পারে না। রাশিয়ার উপযোগী বিপ্লবী তত্ত্ব নির্ধারণের জন্য প্রয়োজন ছিল রাশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থার সঠিক ও মার্কসবাদসম্মত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। এই কাজটি তিনি সাইবেরিয়াতে নির্বাসিত থাকাকালীন সময়ে সেরে ফেলেন 'রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ' ('The Development of Capitalism in Russia') বইটি লিখে। নারদনিকদের এক অদ্ভুৎ তত্ত্ব তখন রাশিয়ার ছাত্র-যুব-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করে ছিল। তাদের তত্ত্ব ছিল যে, রাশিয়াতে পুঁজিবাদের বিকাশ হয়নি এবং বিকাশের কোন সম্ভাবনাও নেই। সেই কারণে সামাজিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বদানকারী কোন ভূমিকা থাকতে পারে না। রাশিয়াতে বিপ্লবী শ্রেণি

হলো একমাত্র কৃষকরা। এই বইটি শুধুমাত্র নারদনিকদের অর্থনৈতিক মতবাদকে ভ্রান্ত প্রতিপন্নই করেনি, অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণের মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত তা বোঝার জন্য এই বইটির পাঠ আজও খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

যদিও মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি, মার্কসীয় বিজ্ঞানের যৌক্তিকতা বোঝার জন্য এই বইয়ের নাম তুলনামূলকভাবে অনুল্লেখিত থাকে।

মার্কসীয় চিন্তাধারায় একটা কমিউনিস্ট পার্টির গঠন প্রক্রিয়া কেমন হবে তাও সমস্ত দিক থেকে খুব সুনির্দিষ্ট ছিল না। লেনিনের সামনে পার্টি হিসাবে জার্মানির স্যোসাল ডেমোক্র্যেটিক ওয়ার্কার্স পার্টি (the Social-Democratic Workers' Party of Germany) গড়ে ওঠার অভিজ্ঞতা ভিন্ন অন্য কোন দৃষ্টান্ত ছিল না। লেনিনকে তাই রাশিয়াতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের শুরুতেই একটি শ্রমিকশ্রেণির দল গঠন প্রক্রিয়া কেমন হবে এবং শ্রেণিসংগ্রামকে সফলভাবে বিপ্লবের দিকে পরিচালিত করার জন্য সেই দলের কি কি বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক হবে তা নিয়ে দীর্ঘ বিতর্ক করতে হয়েছে। এইসবের পরিপ্রেক্ষিতেই লেনিন 'কি করিতে হইবে' (What is to be done) পুস্তিকাটি লিখেন, যেখানে তিনি দৃঢ়ভাবে জানিয়েছিলেন যে 'সংগঠনের মর্মবস্তু নির্ধারিত হয় তার বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনের নিরীখে'। বিভিন্ন রকম সুবিধাবাদী পাতিবুর্জোয়া মতধারার বিরুদ্ধে লড়াই করেই লেনিনকে যথার্থ শ্রমিকশ্রেণির দল হিসাবে আর-এস-ডি-এল-পিকে গঠন করতে হয়েছে। বিপ্লবের নেতৃত্বকে শ্রেণিচেতনার প্রতি অবিচল রাখতে এবং সমস্তরকম দোদুল্যমানতা থেকে রক্ষা করতে এই দল গঠিত হতে হবে একদল পেশাদার বিপ্লবীদের দিয়ে তা সেদিনই লেনিন তাঁর বিপ্লবী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিলেন। তিনি বলেছিলেন 'ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একদল পেশাদার বিপ্লবীদের নিয়ে গঠিত নেতৃত্বের উপর আন্দোলনের দায়িত্ব ন্যস্ত করা উচিত'। (ভল্যুম-৬, পৃ-২৪৬)।

কমিউনিস্ট দল গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ের বিতর্কের রূপরেখা আছে 'এক পা আগে, দুই পা পিছে' বইয়ে। সেখানে তিনি বলেছেন, পার্টির কাজের কেন্দ্রীয়করণের জন্য আদর্শগত বিষয়ে ঐকমত্য পার্টির ঐক্যের পর্যাপ্ত শর্ত নয়। তারজন্য তার সাথে সাংগঠনিক কেন্দ্রিকতা প্রয়োজন। রাশিয়ার মাটিতে সফলভাবে বিপ্লব সংগঠিত করার পথে সাংগঠনিক কেন্দ্রিকতার আবশ্যকতা সম্পর্কে লেনিন বলেছেন, 'আর এই ক্ষমতা দখলের লড়াইতে সর্বহারাদের সংগঠন ব্যতিরেকে অন্য কোন হাতিয়ার নেই। মার্কসীয় নীতির ভিত্তিতে আদর্শগত একত্রীকরণের মধ্য দিয়ে সর্বহারাশ্রেণি একটি অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত হতে পারে, এবং অবশ্যই হবে, তার সাথে যুক্ত হয়ে লক্ষ লক্ষ সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের সংঘবদ্ধ সাংগঠনিক ঐক্য শ্রমিকশ্রেণিকে দৃঢ়বদ্ধ এক বাহিনীতে পরিণত করবে।' (ভল্যুম-৭, পৃ-৪১২) কিন্তু লেনিন তাঁর দীর্ঘ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে এই সত্যে উপনীত হয়েছিলেন যে সাংগঠনিক কেন্দ্রিকতা ধারণাই করা যাবে না কোনরকম আনুষ্ঠানিক শাসনবিধি (formal Rules) ব্যতিরেকে। (ভল্যুম-৭, পৃ-৩৮৫) কমিউনিস্ট পার্টিতে শৃঙ্খলার বিষয়টি লেনিনের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। রোজাও মনে করেছিলেন এবং ভুল বুঝেই, লেনিনের সমালোচনা করেছিলেন এই যুক্তিতে যে, লেনিন অত্যধিক কেন্দ্রিকরণের পক্ষে। রোজার সমালোচনার উত্তরে লেনিন পরিষ্কার করে বলেছিলেন যে, ইস্ক্রার সম্পাদকমণ্ডলী নিয়ে মেনশেভিকদের সাথে বিবাদে লেনিনের অন্যতম যুক্তি ছিল কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত মেনে চলার বাধ্যবাধকতা।

সমস্ত দিক থেকে একটি মার্কসবাদী পার্টি গঠনের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা তিনি দাঁড় করিয়েছিলেন। আজকে বলশেভিকবাদ বলতে বিশ্বে কমিউনিস্টরা যা বোঝে তার কাঠামোটা খুঁজে পাওয়া যাবে লেনিনের ওই সময়ের তীব্র মতবাদিক লড়াইয়ের মাঝে। লেনিন দেখিয়েছিলেন যে, শ্রমিকশ্রেণির সচেতনতা যথার্থ শ্রেণি-চেতনা হতে পারে না যদি না 'জীবনের সমস্ত দিককে (the materialist estimate of all aspects of the life) ব্যপ্ত করে বস্তুবাদী বিশ্লেষণ ও বিচার ব্যবহারিক কাজে প্রয়োগ' করতে পারা শেখা যায়। এই তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা থেকেই মার্কসবাদ শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক দর্শন নয়, হয়ে ওঠে সর্বাঙ্গীন জীবন-দর্শন। (ভল্যুম-৫, পৃ-৪১২)

শ্রমিকশ্রেণির কাছে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতন অত্যন্ত দুঃখজনক সন্দেহ নেই। কিন্তু এটাই বাস্তবে ঘটেছে, যেমন শ্রমিকশ্রেণির প্রথম ক্ষমতা দখলের প্রয়াস প্যারি কমিউন ব্যর্থ হয়েছিল। মার্কস এবং এঙ্গেলস দুইজনেই প্যারি কমিউন থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো আমাদের কাছে তুলে ধরেছিলেন। সেই শিক্ষা গ্রহণ করে লেনিন নভেম্বর বিপ্লবের উপযুক্ত সংগঠন এবং রাস্তা খুঁজে নিয়েছিলেন। তেমনি আমাদেরও সোভিয়েতের পতনের কারণ অনুসন্ধান করতে হবে, শিক্ষা নিতে হবে। নিশ্চিতভাবেই কিছু ভুল-ত্রুটি ঘটেছিল, নাহলে ৭০ বছরের এত অর্জনের পর একটা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়বে কেন? ভেঙে পড়ার কারণ কারো কারো মতে তথাকথিত 'সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদ'–বিষয়টিকে এমনভাবে শুধুমাত্র উপরিকাঠামোর সমস্যা হিসাবে দেখাটা অতি সরলীকরণ। শুধু তাই নয়, আমরা আগেও বলেছি যে, 'সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদ' বলাটাই সঠিক হয় না, এই নামে বললেও তা আসলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় 'বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ'–কেই বোঝায়। সেভাবে বলাই সঠিক। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বুর্জোয়া সংস্কৃতির অবশেষ হিসাবে বহুদিন পর্যন্ত ব্যক্তিবাদ থাকবে এবং প্রবলভাবেই থাকার কথা, অন্তত রাতারাতি তা সমাজ থেকে উধাও হয়ে যাওয়ার কথা নয়। তা কেউ ভাবেওনি যে সহজে বা দ্রুত চলে যাবে। সেই সম্পর্কে লেনিন এবং স্ট্যালিনের হুঁশিয়ারির কথা আমরা জানি। সেই অর্থে সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তিবাদ খুঁজে পাওয়া কোন নতুন আবিষ্কার নয়, অজানা তথ্যও নয়। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হিসাবে বিষয়টি অনুধাবনের ক্ষেত্রে আমাদের কাছে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিচার্য বিষয় তা হলো সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক-সামাজিক ব্যবস্থায় রয়ে যাওয়া ক্ষুদ্র পুঁজি কীভাবে তার চারণভূমি ক্রমাগত প্রসারিত করে ভিত্তিমূলে (base) নিয়ন্ত্রণকারীর জায়গা দখল করে নিল। কোন্ কোন্ নীতি পরিবর্তনের কারণে তা সম্ভব হয়েছে? কবে থেকে সেই নীতির পরিবর্তন করা শুরু হয়েছে? সেই নিয়ে দলের অভ্যন্তরে কতটুকু প্রতিরোধ হয়েছে, না হলে কেন হলো না? এইসব বিচার না করে, ভিত্তিমূলে (base) কোন পরিবর্তন ছাড়া শুধুমাত্র উপরকাঠামোয় বুর্জোয়া সমাজের অবশেষের ধাক্কায় সমাজতন্ত্রের পতন ঘটে গেল এভাবে ব্যাখ্যা করা সম্পূর্ণভাবে অমার্কসীয় বিশ্লেষণ বলেই আমরা মনে করি। ব্যক্তি উপলব্ধির উপর নির্ভর না করে আমাদের তথ্যের উপর দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী বিশ্লেষণ দাঁড় করাতে হবে। একমাত্র তখনই আমরা সোভিয়েতের পতনের যথার্থ কারণ খুঁজে পেতে পারি এবং শিক্ষাগ্রহণ করতে পারি।

অন্যদিকে, সোভিয়েতের পতনের পর সাম্যবাদী শিবিরের কোন কোন অংশ এবং বুর্জোয়া শিবির থেকে উত্থাপিত যে বিষয়টি বারংবার ত্রুটি বা অভিযোগের আকারে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার যৌক্তিকতাকে আঘাত করেছে অথবা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার কারণ হিসাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা হয়েছে তা হলো সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের অপ্রতুলতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে। এই অভিযোগের সারবত্তা আছে কিনা তা আমাদের অবশ্যই খুঁজে দেখতে হবে। গণতন্ত্রের

অপ্রতুলতা কিছু ঘটে থাকলে তা সহযোগী উপাদান হিসাবে কাজ করে থাকতেও পারে, কিন্তু মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে তা কখনোই মূল কারণ হতে পারে না। এই যুক্তির মধ্যেও এক ধরণের অতি সরলীকরণ আছে। দীর্ঘ সময় ধরে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার যতটুকু ভিত্তি গড়ে উঠেছিল তাকে অস্বীকার করে বুর্জোয়াদের প্রচারিত গণতন্ত্রের অভাবকেই মূল কারণ হিসাবে চিহ্নিত করলে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হয় না। তাছাড়া, এইভাবে বললে সোভিয়েতের পতনে সংশোধনবাদী চিন্তার প্রভাবকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়। যদিও গণতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে তত্ত্বগতভাবে কোন বিরোধ আছে কিনা সেটা গভীরভাবে পর্যালোচনা করার প্রয়োজন আছে। কেননা, সাধারণভাবে বুর্জোয়া সমাজের মধ্যে এই নিয়ে চরম বিভ্রান্তি আছে।

লেনিন বুর্জোয়া পার্লামেন্ট ব্যবস্থার বিরোধিতা করলেও কোনদিনই জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যবস্থার বিরোধিতা করেননি। তিনি বলেছিলেন–'তবে আমরা যদি রাষ্ট্রের প্রশ্নটি নিয়ে বিচার করতে বসি এবং যদি আমরা এই ক্ষেত্রে প্রলেতারিয়েতের করণীয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে পার্লামেন্টকে রাষ্ট্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচনা করি, তবে সংসদীয়তার (parliamentarism) বাইরে যাওয়ার উপায় কী? কীভাবে এর থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে? এই সংসদীয়তা থেকে বেরিয়ে আসার উপায় অবশ্যই প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠানগুলির বিলুপ্তকরণ নয় বা প্রতিনিধি নির্বাচনের নীতি বাতিল করা নয়, তবে প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠানগুলিকে বকবক করার জায়গার বদলে কাজের ('working') প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করতে হবে। 'কমিউন হবে কাজের, পার্লামেন্টারি না, সংস্থা-একই সাথে নির্বাহী এবং আইনসভা'। ('The commune was to be a warking, not a parliamentary, body, executive and legislative at the same time.') (ভল্যুম-২৫, পৃ-৪২৮)

লেনিনীয় মডেল অনুসরণ করলে সমাজতন্ত্রে বরং গণতন্ত্র অনেক বেশি কার্যকরী ও প্রসারিত হওয়ার কথা। 'কমিউন দূষিত এবং পচা বুর্জোয়া সমাজ প্রতিষ্ঠান সংসদীয়তাকে (parliamentarism) প্রতিস্থাপিত করবে, যেখানে মতামত ও আলোচনার স্বাধীনতা প্রতারণায় পরিণত হবে না, কারণ সংসদ সদস্যদের নিজেদেরই কাজ করতে হবে, তাদের নিজেদের তৈরি আইনকে নিজেদেরই বাস্তবায়িত করতে হবে, বাস্তবে প্রাপ্ত ফলাফলগুলি নিজেদেরই পরখ করে দেখতে হবে এবং তাঁরা সরাসরি নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন। প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান থাকবে, তবে এমপি ও কার্যনির্বাহী দলের মধ্যে শ্রমের বিভাজন, ডেপুটিদের জন্য সুবিধাভোগী অবস্থান ইত্যাদির জন্য একটি বিশেষব্যবস্থা হিসাবে সংসদ থাকবে না। প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে আমরা গণতন্ত্র, এমনকি সর্বহারা গণতন্ত্র, কল্পনাও করতে পারি না, তবে সংসদীয়তা (parliamentarism) ব্যতীত আমরা গণতন্ত্র কল্পনা করতে পারি এবং করিও। (ভল্যুম-২৫, পৃ-৪২৯)

সেই প্রতিনিধিত্বকারী সভাকে লেনিন 'পার্লামেন্ট'ই বলেছেন–শ্রমিকশ্রেণির রাষ্ট্রে সর্বহারার পার্লামেন্ট। লেনিন লিখেছেন–'এই সমস্ত উদ্যোগ প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকরা অবশ্যই 'প্রতিনিধি নির্বাচিত করবে যাঁরা এক প্রকার পার্লামেন্ট গঠন করবেন'। তবে, পুরো বিষয়টি হলো এই 'ধরণের পার্লামেন্ট' বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি প্রতিষ্ঠানের অর্থে পার্লামেন্ট হবে না।' (ভল্যুম-২৫, পৃ-৪৮৬)

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রথম থেকেই প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তের উপর নির্মিত হয়েছে, এমন কি ক্ষমতা দখলের সিদ্ধান্তও সোভিয়েতের নেওয়া, এককভাবে কোন দলের নেতৃত্বের নয়। লেনিন যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা হলো–'সমগ্র অর্থনীতি সংগঠিত করাই... সমস্তই সশস্ত্র সর্বহারা শ্রেণির নিয়ন্ত্রণ ও নেতৃত্বে –আমাদের আশু লক্ষ্য। এই আমাদের রাষ্ট্র এবং এটি আমাদের আকাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক ভিত্তি। এটাই পার্লামেন্টারিজমকে বিলুপ্ত করবে কিন্তু প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষণ করবে। এ হলো তাই, যা বুর্জোয়া শ্রেণির পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের হাত থেকে শ্রমজীবী শ্রেণিকে মুক্তি দেবে।' (ভল্যুম-২৫, পৃ-৪৩২)

রাষ্ট্রীয় স্তরে এই ছিল গণতন্ত্র সচল রাখার নীতি যা লেনিন নির্দিষ্ট করেছিলেন। এর মধ্যে কোথাও গণতন্ত্রহীনতা নেই, বরং গণতন্ত্রকে সত্যিকারের অর্থে সর্বহারাদের মাঝে প্রসারিত করার ব্যবস্থা হিসাবেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা উচ্চারিত হয়েছে। গণতন্ত্রকে আরো গভীরে নিয়ে যাওয়া, আরো বেশি কার্যকর করা, আরো বেশি তৃণমূল স্তরের মানুষকে সেই ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করাই ছিলো নীতি। রাষ্ট্রে বা সমাজে পুঁজির ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকারের স্বীকৃতি, অন্যের শ্রম-শোষণের স্বীকৃতি, আয় ও ধন বণ্টনে বৈষম্যের স্বীকৃতি, ইত্যাদি না থাকলে বুর্জোয়ারা, রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে যথেষ্ট গণতান্ত্রিক নয় বলে মনে করে। তাদের ধারণায় ব্যক্তিকে পুঁজির শোষণের যন্ত্রে শ্রম-শক্তি বিক্রির দাসে পরিণত করার অধিকার না দিলে যথেষ্ট গণতন্ত্র আছে প্রমাণিত হয় না। এইসব বিচারে যদি কেউ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গণতন্ত্র খুঁজতে যান, তবে অবশ্যই তা পাবেন না। কিন্তু যদি জনগণের মত প্রকাশের অধিকার ও জনপ্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান খোঁজেন তা অবশ্যই পাবেন।

দলের অভ্যন্তরেও নীতি নির্ধারণ, কর্মসূচি প্রণয়ন ও রূপায়ণ ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে দল পরিচালিত হয় গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি অনুসরণ করে। কমিনটার্নের তৃতীয় কংগ্রেসে (১৯২১ সাল) লেনিন আমাদের এই সম্পর্কে যে ধারণা দিয়েছিলেন তা হলো যে, কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ অবশ্যই হতে হবে একটি আসল সমন্বয় (synthesis), কেন্দ্রীকতা এবং সর্বহারা গণতন্ত্রের একীভবন (fusion)। এই ফিউশন অর্জন সম্ভব কেবলমাত্র পুরো পার্টি সংগঠনের মধ্যে (constant common activity, constant common struggle) (নিরন্তর যৌথ কর্মকাণ্ড, নিরন্তর যৌথ সংগ্রাম)–এর ভিত্তিতে। কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনে কেন্দ্রিকরণ বলতে আনুষ্ঠানিক এবং যান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণের ধারণা বোঝায় না, বরং কমিউনিস্ট কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রীকরণ বোঝায়, বা বলা যায়, এক শক্তিশালী নেতৃত্ব গড়ে তোলা বোঝায়, যে নেতৃত্ব যে কোন সময়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকবে এবং একই সাথে পরিবেশ পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুযায়ী দ্বান্দিক বস্তুবাদী দৃষ্টিতে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম। এই প্রসঙ্গে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার লেনিনীয় ভাবনা বোঝার জন্য অবশ্য বিশদ আলোচনা প্রয়োজন।

আদর্শগত এবং সাংগঠনিক দুই কেন্দ্রিকতার কথাই লেনিন বলেছেন–গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা কমিউনিস্ট দলের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সচল রাখার পদ্ধতি। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার এই লেনিনীয় নীতি চিনের কমিউনিস্ট পার্টি কীভাবে কার্যকরি করেছিল তাও আমাদের কাছে দৃষ্টান্ত হিসাবে আছে। যখন বিপ্লব সম্পূর্ণ অর্জিত হয়নি, বিপ্লবী যুদ্ধ চলছে, ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চিনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কমরেড মাওয়ের 'পার্টি কমিটিকে

শক্তিশালী করা' সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রস্তাবটি ছিল কীভাবে দলের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্তরে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে সেই সম্পর্কে। বিপ্লবের পরে, ১৯৫৬ সালে যখন পার্টির অষ্টম জাতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় তখন পার্টির সংবিধানের সংশোধনীর উপর একটি রিপোর্ট পেশ করতে গিয়ে কমরেড মাও ১৯৪৮ সালের সেই প্রস্তাবের গুরুত্বের কথা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন–

'যৌথ নেতৃত্ব নিশ্চিত করতে এবং কোন বিষয় পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন একজন ব্যক্তির একাধিপত্য রোধ করার জন্য পার্টি কমিটির ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ দলীয় প্রতিষ্ঠান। কেন্দ্রীয় কমিটির ব্যুরো থেকে শুরু করে প্রিফেকচুরাল (শাখা) পার্টি কমিটি পর্যন্ত; ফ্রন্টের পার্টি কমিটি থেকে শুরু করে ব্রিগেড এবং সামরিক অঞ্চলের পার্টি কমিটিগুলোর সকল নেতৃস্থানীয় স্তরে পার্টি কমিটি বৈঠকের একটি যুক্তিসিদ্ধ (বা অটুট, sound) ব্যবস্থা স্থাপন করতে হবে। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা (তবে গুরুত্বহীন, তুচ্ছ বিষয়গুলো অথবা যেগুলো সম্পর্কে ইতিমধ্যেই সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং এখন শুধু কাজে পরিণত করতে হবে সেইগুলো নয়) অবশ্যই আলোচনার জন্য কমিটির সভায় পেশ করতে হবে এবং উপস্থিত সদস্যদের সেই সম্পর্কে তাদের মতামত পুরোপুরি প্রকাশ করতে হবে এবং নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পর সংশ্লিষ্ট সকল সদস্য সেই অনুযায়ী কাজ করবেন। যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, যেগুলো জটিল এবং যা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে সভার আগে ব্যক্তিগত স্তরে সদস্যদের সাথে পরামর্শ করতে হবে যাতে তাঁরা সভার আগে থেকেই ভাবনা-চিন্তা করে আসতে পারেন, নাহলে সভার সিদ্ধান্ত নিছক আনুষ্ঠানিকতা হয়ে যায় অথবা কোন সিদ্ধান্তেই পৌঁছানো যায় না। পার্টি কমিটির সভাগুলোকে অবশ্যই দুটোভাগে ভাগ করতে হবে–একটি স্থায়ী কমিটির সভা, অন্যটি পূর্ণাঙ্গ সভা (plenary sessions) এবং এই দুটোকে কখনোই গুলিয়ে ফেলা উচিত না। তদুপরি, আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে যৌথ নেতৃত্ব বা ব্যক্তিগত দায়িত্বের কোন একটিকে বেশি গুরুত্ব দিতে গিয়ে অন্যটিকে যেন অবহেলা না করা হয়।' (নির্বাচিত রচনাবলি, ৪র্থ, পৃ-২৬৭) কেন্দ্রীয় কমিটির কোন একজন নেতার মধ্য দিয়ে যৌথ জ্ঞানের ব্যক্তিকরণ ঘটলেই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা পালন করা হয়, নচেৎ সবই যান্ত্রিক এমন ভাবনা বস্তুবাদের সাথে সম্পর্কহীন এবং কমিউনিস্ট অথরিটিদের কেউ এমন ভাবেননি।

এই কারণে, একটি কমিউনিস্ট দলের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার যথার্থ অনুশীলন নির্ভর করে কয়েকটি প্রাথমিক শর্ত পূরণের উপর। সেইগুলো হলো দলের সদস্যদের শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি ও শ্রেণি সচেতনতার প্রয়োজনীয় স্তরে পৌঁছানো, দলের বিভিন্ন কমিটিতে পারস্পরিক মতের বিনিময়ের মাধ্যমে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে পরিচালিত মতবাদিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে পারার সক্ষমতা এবং সর্বহারা বিপ্লবে সচেতন ভূমিকা গ্রহণ। আন্দোলন, সংগ্রাম পরিচালনাকালে একটি কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে নানা বিষয়ে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হবে সেটাই স্বাভাবিক। এই দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে আদর্শগত প্রশ্নে বা কর্মসূচি নির্ধারণে বা তার রূপায়নে কৌশলগত প্রশ্নে। মার্কসবাদ বা বিজ্ঞান অনুযায়ী দ্বন্দ্ব বিকাশের নিয়মের অঙ্গ, যাকে পরিহার করার অর্থ স্থবিরতাকে আহ্বান করা। লেনিন বলেছিলেন–'The condition for the knowledge of all processes of the world in their 'self-movement,' in their spontaneous development, in their real life, is the knowledge of them as a unity of opposites. Development is the 'struggle' of opposites.' (Lenin, Vol- 38, p-358)

এই বিষয়ে এঙ্গেলসেরও স্পষ্ট বিশ্লেষণ আছে। ১৮৮২ সালে বার্নস্টাইনকে (তখনো তিনি সংস্কারবাদীদের সাথে যোগ দেননি) একটি চিঠিতে লেখেন–'মনে হচ্ছে প্রতিটি বড় দেশে একটি শ্রমিকশ্রেণির দল শুধুমাত্র আভ্যন্তরীণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিকশিত হতে পারে, সাধারণভাবে দ্বান্দ্বিক বিকাশের নিয়মের সাথে যা সঙ্গতিপূর্ণ।' অর্থাৎ, একটি দল যে ইনার-পার্টি স্ট্রাগলের মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করে এই ঘটনা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শনকেই সত্য বলে প্রমাণ করে। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কর্মসূচিকে যৌথভাবে সম্পন্ন করাকে নিশ্চিত করে। এটা একই সাথে চিন্তার স্বাধীনতাকে এবং কর্মের ঐক্যকে নিশ্চিত করে। Freedom to Criticise and Unity of Action–এই হলো লেনিনের কথা। 'যতক্ষণ না এটি কোন নির্দিষ্ট কাজের ঐক্যকে বিঘ্নিত না করে ততক্ষণ গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার এবং স্বায়ত্তশাসনের নীতি বলতে সমালোচনা করার সর্বজনীন এবং পূর্ণ স্বাধীনতা বোঝায়, এটি তেমন সব সমালোচনারই বিরুদ্ধে যা পার্টি নির্ধারিত কোনও কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে ঐক্যকে বাধাগ্রস্ত করে বা কঠিন করে তোলে।' (ভল্যুম-১০, পৃ-৪৪২-৪৩) অর্থাৎ, কেউ যদি স্বাধীনতার নামে কাজ পণ্ড করতে চায় তবে সেই দাবিকে নিশ্চয়ই মেনে নেওয়া হবে না।

কিন্তু, মার্কসবাদীদের কাছে করণীয় হলো দলের ঐক্য, সংহতি ও সর্বহারা শ্রেণিচরিত্র সমুন্নত রেখে এই সমস্ত দ্বন্দ্বগুলোকে নিরসন করা। কীভাবে নিরসন হতে পারে? 'অথরিটি'-র নামে সবকিছু উপর থেকে চাপিয়ে দিয়ে? না। নিরসন হবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার পদ্ধতি অনুসরণ করে। কমিউনিস্ট পার্টিতে 'অথরিটি'-র ধারণা থাকবে, কিন্তু গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা দলের অভ্যন্তরে ক্রিয়াশীল না থাকলে 'অথরিটি' পরিণত হবে 'কর্তৃত্ববাদে' (authoritarianism)। মার্কসবাদীদের কাছে এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য একেবারে মৌলিক। কর্তৃত্ববাদে মনে করা হয় 'অথরিটি' চূড়ান্ত, সর্বোত্তম, ভুল করতে পারে না বা সে সমালোচনার উর্ধ্বে। কর্তৃত্ববাদে 'অথরিটির'-র সাথে সংগ্রাম নেই, সমালোচনা নেই, অন্ধ আনুগত্য আছে। যুক্তি-বুদ্ধি-বিচার ছাড়িয়ে যা ক্রমেই নেতাকে পূঁজা করার আচরণবাদীতায় পর্যবসিত হয়। মার্কসবাদী দলে এর উপলব্ধি ঠিক তার বিপরীত–গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার মাধ্যমে অথরিটির সাথে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের ভিত্তিতে সচেতন আন্ত-পার্টি সংগ্রাম (inner party struggle) ঐক্যকে সুদৃঢ় করে এবং কেন্দ্রিয় কমিটি যৌথ নেতৃত্বের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হয়।

একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে একজন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী জানেন যে, দলের ভেতর যে সমস্ত বিষয়ে দ্বন্দ্ব তৈরি হয় সেইগুলো একই রকমের নয়। তার নিরসনের পদ্ধতি বা মাপকাঠিও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার অনুশীলনের ক্ষেত্রে একই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয় না। মূলত দুই ধরণের বিষয়ে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। কোন কোন দ্বন্দ্বের চরিত্র মিলনাত্মক (non-antagonistic) এবং কিছু দ্বন্দ্বের চরিত্র বিরোধাত্মক (antagonistic)। মিলনাত্মক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে ঐক্যমতে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয় এবং সমঝোতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যদি কোন নীতিগত বিষয়ে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় যার সাথে শ্রেণিস্বার্থ বা শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্ন জড়িত তবে সেইগুলো বিরোধাত্মক চরিত্রের এবং সেই ক্ষেত্রে সমঝোতার বিষয় থাকে না। সেই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয় যতক্ষণ না কোন একটা মত সত্য বলে গৃহীত হয় বা তৃতীয় কোন সত্য এসে উপস্থিত হয়।

কী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়, কী দলের অভ্যন্তরে, গণতন্ত্র সম্পর্কে এই যখন কমিউনিস্ট মতাদর্শগত ধারণা তখন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রহীনতার অভিযোগ ওঠা এবং সেই সম্পর্কে লেনিনীয় মডেলকে যাঁরা প্রশ্নবিদ্ধ করেন তখন কোন দূরভিসন্ধি আছে বলে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। এই দূরভিসন্ধি সম্পর্কে সজাগ থেকেই আমাদের যেটা পর্যালোচনার বিষয় হতে পারে তাহলো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে হোক বা দল পরিচালনার ক্ষেত্রে হোক এই নীতি অনুসরণ করার ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় দীর্ঘদিন ধরে ব্যতিক্রম ঘটেছে কিনা। যদি তা হয়ে থাকে তবে তার কারণ অনুসন্ধান করা, বিশ্লেষণ করা ও শিক্ষা নেওয়া দরকার।

লেনিন সাম্রাজ্যবাদকে পুঁজিবাদের বিকাশের সর্বোচ্চ স্তর হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন যা একাধারে চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল এবং সংকটগ্রস্ত ও মরণাপন্ন। গত একশ বছরে বহু সংকটাপন্ন অবস্থা পুঁজিবাদ কাটিয়ে উঠেছে ঠিকই, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, কেউ বলতে পারছে বা মনে করে পুঁজিবাদের সংকট চিরকালের জন্য দূর হয়ে গেছে। এমনকি বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরা বা তাদের সমর্থকরাও তা বলেন না। বরং প্রতিটি সংকট থেকে পরিত্রাণের পন্থা যে নতুন করে ভিন্ন সংকট ডেকে আনছে তা সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন। পুঁজি ও পণ্যের শুল্কবিহীন অবাধ চলাচল ব্যবস্থার বিশ্বায়ন যে সংকট থেকে মুক্তি দেয়নি তা ক্রমেই সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বিরোধ মাথাচাড়া দেওয়া বা চীন আমেরিকার বাণিজ্য যুদ্ধের মহড়াতেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আমেরিকা হোক বা চীন প্রত্যেকেই নতুন করে শুল্ক আরোপ করাকেই নিজ নিজ দেশের অর্থনীতিকে রক্ষা করার উপায় হিসেবে প্রকাশ্যেই ঘোষণা করছে।

বর্তমান সময়ে একই বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে লগ্নী পুঁজি চেহারা পাল্টেছে, ঋণ পুঁজি এবং fictitious capital ফাটকা পুঁজির আকারে বিশ্বব্যবস্থাকে real sector থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। যখন করোনায় আক্রান্ত পৃথিবীতে সমস্ত কল, কারখানা বন্ধ, উৎপাদন বন্ধ তখনও শেয়ার মার্কেটের সূচকে তার কোন প্রতিফলন নেই। এই কথা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে বর্তমান পুঁজিবাদী বিশ্বে real sector Ges financial system-এর কার্যকলাপ একে অপরের থেকে কতটা বিচ্ছিন্ন হতে পারে। এই অবস্থা নিশ্চিতভাবে লেনিনের সময় ছিল না। বুর্জোয়া অর্থনীতিতে অতিউৎপাদনের সমস্যা তার মজ্জাগত এবং জন্মলগ্ন থেকেই আছে, যে সংকটের সহজাত চরিত্রের (inherent character) কথা দেখিয়েছিলেন কার্ল মার্কস। এই মজ্জাগত সমস্যার কারণেই বুর্জোয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সর্বদা বিরাজ করে অনিশ্চয়তা। সেই অনিশ্চয়তাই ফিরে ফিরে ডেকে আনে সংকট। অর্থাৎ অর্থনীতিতে মন্দা। এই কারণে আমরা দেখেছি পুঁজিবাদী বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এযাবতকাল সংকট সর্বদা সৃষ্টি হয়েছে ভোগ্যপণ্য বাজারের অবিক্রিত পণ্য থেকে বা বাজারের অভাব থেকে। গত কয়েক দশক ধরে বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সংকট প্রথমে তৈরি হচ্ছে পুঁজি বাজার (finacial market)-এ ধ্বসের কারণে এবং সেখান থেকে পরবর্তী সময়ে মন্দা ছড়িয়ে পড়ছে পণ্য বাজারে। এই অবস্থাও লেনিনের সময় ছিল না। পুঁজিবাদের এই চরিত্রের ব্যাখ্যা, সার্বিকভাবে পুঁজিবাজার ও পণ্যবাজারের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও দ্বন্দ্বের রূপ, বিভিন্ন শক্তির অবস্থান ও দ্বন্দ্বের স্বরূপ আমাদের ব্যাখ্যা করতে হবে। এই প্রেক্ষিতেই লেনিনের 'সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ রূপ' বইয়ের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে সম্প্রসারিত করার বিষয় কর্তব্য হিসেবে দেখা দেয়।

লেনিন সাম্রাজ্যবাদকে পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর হিসাবে ব্যাখ্যা করার সময় দেখিয়েছিলেন বড় পুঁজিবাদী বা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো নিজেদের মধ্যে পৃথিবীকে ভাগ করে নিয়েছে (the territorial division of the whole world among the biggest capitalist powers is completed)। এখন পুঁজি আর সেই নির্দিষ্ট বিভাজনের চরিত্রের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ নয়, পুঁজির বিচরণশীলতা দেখে জাতি-রাষ্ট্রের চরিত্র অনুধাবন করা সহজ নয়, সেই সম্পর্ক যথেষ্ট জটিল অথবা পার্থক্যরেখা খুবই অস্পষ্ট। এই নতুন বাস্তবতাকেও লেনিনীয় পথে নতুন করে আমাদের বুঝে নিতে হবে।

আমরা তো জানি পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ নিজে থেকে সরে যাবে না বা ভেঙে পড়বে না। এই প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদ কতটা নগ্ন, কতটা বর্বর, মানুষ সম্পর্কে কতটা উদাসীন এবং নির্দয় অশ্রুসজল চোখে তারই বর্ণনাও আমাদের কোন পথ দেখাবে না। সাধারণ গরিব মানুষ, শ্রমজীবী মানুষ তাদের নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা থেকে নির্দয়তা, মায়া-মমতাহীনতার রূপ ভালো করেই জানে। বর্তমান সময়ের করোনা ভাইরাসের আক্রমণের মুখে আমরা আবার তারই পরিচয় পেলাম যে মানুষের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কতটা অবহেলিত। সামরিক প্রস্তুতি রাষ্ট্রের কাছে শিক্ষা-স্বাস্থ্যের চেয়ে বেশি অগ্রাধিকার পায়। দিনমজুর ও খেটে খাওয়া মানুষকে কীভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারে বর্তমান ব্যবস্থা। তাও দেশে দেশে আমরা প্রত্যক্ষ করছি। পুঁজির একচ্ছত্র লাঠি ঘোরানোর বিপরীতে শ্রমিক, কৃষক বা জনতার সংগঠিত আন্দোলন বিশ্বজুড়েই প্রায় অনুপস্থিত। অতি সাম্প্রতিককালে যে যে উল্লেখযোগ্য আন্দোলন গড়ে উঠেছে সেইগুলোর চরিত্র সবই স্বতঃস্ফূর্তার উপর নির্ভর করে। জনগণের স্বতঃস্ফূর্তার উপর নির্ভরশীল যে কোন আন্দোলনই খুব ক্ষণস্থায়ী হয়, সব আন্দোলনগুলো পরিণতিতে তাই কোন উল্লেখযোগ্য ফলাফল না এনেই মিলিয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতির মূল্যায়ন ও করণীয় আমাদের ভেবে দেখতে হবে।

যে কথাটা আমাদের গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে তা হলো এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে চাই শ্রমিকশ্রেণির প্রস্তুতি এবং সাংগঠনিক শক্তি। উপরে উল্লেখ করা সব কয়টা সমস্যার ক্ষেত্রেই মার্কসবাদের সৃজনশীল প্রয়োগ এখন সময়ের চাহিদা, না হলে শ্রমিকশ্রেণির উপর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না। এই প্রস্তুতির জন্য মার্কসের তত্ত্ব ও লেনিনের শিক্ষা আমাদের পথ দেখাবে, কিন্তু তারজন্য লেনিনকে বুঝতে হবে, জানতে হবে ভালো করে। তাই আজ শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলন গড়ে তোলার শপথের পাশাপাশি আমাদের নতুন দায়িত্ব ও করণীয় ক্ষেত্রগুলো ঠিক ঠিকভাবে চিহ্নিত করার অঙ্গীকারও করতে হবে।